OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 157 - 163
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শব্দাতীত দহন ও অস্তিত্বের উত্তরণ : ‘অপৌরুষেয়’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে

সুচিস্মিতা কাঞ্জি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: suchismitakanji2020@gmail.com
0009-0007-0781-7493

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Nalini Bera, fiction, gender identity crisis, third gender, rural society, society rules, social acceptance, Tusu festival, motherhood, fantasy and reality.

Abstract

Nalini Bera is a fiction writer from the southwestern part of Bengal. One of his most notable novels is ‘Apourusheya’. The central character of this novel is Anandi. The novel revolves around Anandi's life and her gender identity crisis.

Anandi is not a woman, nor a man. Anandi is a ‘hijra’. A eunuch. But she's not an outcast. She chooses to lives in this society and fight for her rights. Anandi does not beg for her livelihood. Anandi is a full-fledged human being with her own skills. But Anandi knows she is not as perfect as the other five in this society. In the eyes of society, she is imperfect, incomplete, not even human. In the eyes of the society her only identity is ‘Anandi the eunuch’. Anandi knows she is not as ordinary as the other five. Anandi is a different person. Her life is different. Anandi knows the truth of her very existence. How fragile her existence is in this society.

Anandi finds a way to survive in her family and society. Anandi started a poultry business. Understand the power of raw money. Her family happily accept her. But the society accept her partially. Anandi began to move freely in both male and female societies. But the girls don’t truly accept her. Anandi doesn’t mind either. Rather she tries harder. Men are also reluctant to accept her. But they crack obscene jokes to her.

Annoyed with men, Anandi shifts her focus more towards women's society. Anandi’s thoughts begin to shaped by the women around her. Anandi wanted to realise femininity at least once. She wanted to taste motherhood. Anandi can’t be mother of a real baby. So, Anandi wanted to be the mother of Tusu. Tusu is not even a human being. Tusu is folk goddess. Still, she wants to be Tusu’s mother. Anandi wanted to be the mother at least for one night!

But there is a big difference between fantasy and reality. May be Anandi didn’t understand it. She wanted to be a mother, but she couldn't. Anandi’s wish was very big! Anandi is chased out of the premises of Tusu's alter by the real claimants of Tusu’s mother. All of them get together and humiliate Anandi. Anandi's self-existence is shown with their finger in her eyes.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

At last, we can say, Nalini Bera's novel 'Apourusheya' is a timeless anecdote of the unspeakable burning and transition of their existence in the psyche of the entire transgender or hijra people.

Discussion

সাতের দশক থেকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্র আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক মানুষদের একাংশ তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের নিয়ে খুব বেশি কথাসাহিত্য রচিত হয়নি। এই সময়ে রচিত কথাসাহিত্যগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কৌতুহলোদ্দীপক পার্শ্বচরিত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিংবা কৌতুক রস সৃষ্টির জন্য চরিত্রগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠানের নাচ-গানের অনুষঙ্গ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই প্রচলিত ধারাকে চেনা ছক ভেঙে বাংলা কথাসাহিত্যে এক যুগান্তকারী ও সংবেদনশীল সংযোজন নলিনী বেরার 'অপৌরুষেয়' (২০০৭) উপন্যাস।

কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা সাতের দশকের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। নলিনী বেরা তাঁর কথাসাহিত্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের প্রান্তিক লোকজীবনের কথা বলেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের উপজীব্য প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিকভাবে ব্রাত্য, লৈঙ্গিক পরিচয়ে অন্ত্যজ এবং মূলধারার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 'হিজড়া' বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে নলিনী বেরা তাঁর অনন্য উপন্যাস 'অপৌরুষেয়' রচনা করেছেন।

নলিনী বেরা তাঁর 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসে হিজড়াদের প্রতি কোনো কৃত্রিম সহানুভূতি দেখাননি। তিনি উপন্যাসে হিজড়াদের কঠিন জীবন সংগ্রাম ও তাদের অস্তিত্বের সংকটকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে কেবল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের শরীরী সংকটের বর্ণনা নেই। এতে এদের মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়, পারিবারিক বর্জন, সামাজিক অবহেলা, সর্বোপরি এক মৌলিক মানবিক অস্তিত্বের লড়াইয়ের বাস্তবধর্মী শিল্পসম্মত বর্ণনা আছে। এক কথায় 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসে নলিনী বেরা প্রান্তিক মানুষ 'হিজড়া'দের জীবনসংগ্রামের এক মহাকাব্যিক রূপায়ণ।

'অপৌরুষেয়' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল যা পুরুষের দ্বারা তৈরি নয় বা যা পুরুষোচিত নয়। গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ মানুষকে কেবল দুটি মেরুতেই ভাগ করতে অভ্যস্ত। প্রথমটি 'পুরুষ' দ্বিতীয়টি 'নারী'। পূর্বনির্ধারিত এই দুটি লিঙ্গ পরিচয়ের বাইরে থাকা মানুষের অস্তিত্বকে এই সমাজ অস্বীকার করে। এই সামাজিক ভাবে অস্বীকৃত মানুষদের একজন হল আনন্দী। আনন্দী 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আনন্দী নারীও নয়, পুরুষও নয়। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে সে অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। সঠিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়। সমাজের চোখে তার একটাই পরিচয়— 'আনন্দী ক্লীব, নপুংসক, হিজড়া।'

জন্মানোর সাথে সাথেই একটি শিশুর লিঙ্গ পরিচয় স্বীকৃত হয়ে যায়। সমাজ শিশুটির লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাকে 'ছেলে' কিংবা 'মেয়ে' হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু আনন্দীর জীবনে এই স্বাভাবিক সমীকরণটি খাটেনি। পুরুষ বা নারীর সুস্পষ্ট প্রজনন অঙ্গ তার শরীরে ছিল না। বড় হয়ে আনন্দী বুঝেছে তার শারীরিক গঠনের খামতি। আনন্দী নিজের শরীরে বারবার হাত বুলিয়ে অন্যদের থেকে তার দৈহিক স্বতন্ত্রকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে।

> "ঊর্ধ্বাঙ্গে, বুকে, নিম্নাঙ্গে, জানুতে — হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল আনন্দী। না, নারীর বুকের উন্নতি, ঢেউ — তার বুকে নেই। আবার পুরুষের দেহের উন্নতি, দৃঢ়তাও তার নিম্নাঙ্গে নেই। শুধুই সমতল সমতল। এতটুকু আঁকটাক নেই। উন্নতি নেই অবনতি নেই — এ কেমন জীবন? এ কেমন জীবনধারা? এ কেমন নদী? এ কেমন নদীপ্রবাহ?
>
> না-নারী না-পুরুষ, আনন্দী 'হিজড়ে'। আনন্দী অন্যমানুষ। অন্য জিনিস। তবু, যে নদীতে ঢেউ নেই, আছে কেবল টুরিব্যাঙ আর জলঘুন্নি পোকার নিরন্তর 'বুড়বুড়ি', ঊড়াল-ঘূর্ণি নেই, আছে নিষ্করঙ্গ নিস্তেজ নিস্পৃহ জলধারা — সে নদী কি নদী নয়?"[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রকৃতিও যেন তাকে এক অদ্ভুত দোলাচলতার মধ্যে ফেলে দেয়। আনন্দী ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, সে আর পাঁচ জনের মতো সাধারণ নয়। আনন্দী অন্য মানুষ।

আনন্দী নারীও নয়, পুরুষও নয়। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আনন্দী নিজেকে নারীই ভাবতো। নারীসুলভ আচরণ করতো। নারীসুলভ বেশভূষা পরতো। শাড়ি সায়া ব্লাউজ সেমিজ চুড়ি আলতা দিয়ে নিজেকে সাজাতো।

> "বছরকয়েক আগে, শাড়ি শায়া ব্লাউজ — কি না পরত আনন্দী। পায়ে আলতা পরত, কোমর পর্যন্ত একরাশ ঘন কালো চুল। হাতে চুড়ি পরত, গোছা গোছা কাচের চুড়ি ঘুরতে ফিরতে আওয়াজ দিত— রিনঠিন রিনঠিন। রিনঠিন রিনঠিন।"[২]

আনন্দীর এই নারীসুলভ আচরণে বিরক্ত হয়ে আনন্দীর বৌদি এক নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নেয়।

> "একদিন বাটনা বাটা শিলের নোড়া হাতে নিয়ে বড়বউদি ডাকল — আয়। তারপর নোড়া মেরে সবকটা কাচের চুড়ি একলহমায় ভেঙে দিল। টান মেরে খুলে দিল পরনের কাপড়, বুকের সেমিজ। বলল — মুখপুড়ি, তুই কি মেয়ে নাকি যে শাড়ি-চুড়ি-সেমিজ পরবি।"[৩]

আনন্দীর প্রতি তার পারিবারের ক্রুরতা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। একটি মানুষের কাছে তার পরিবার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। হিজড়াদের জীবনের প্রথম প্রত্যাখ্যানটা তাদের নিজের পরিবার থেকেই আসে।

পরিবার ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কটূক্তি ও লাঞ্ছনা এদের নিত্য পাওয়া। 'অপয়া', 'মাইচু', 'হিজড়ে', 'নপুংসক', 'রাঁড়ী', 'মুখপুড়ি', 'মাগী', 'খালভরি' প্রভৃতি সুবচনগুলো এদের প্রাত্যহিক সম্বোধন। আনন্দীকেও প্রায় প্রতিদিনই শুনতে হয়। এক সময় আনন্দীর মনে হয়—

> "মান-অপমান বোধ আর তার বিন্দুমাত্র নেই? 'অপয়া' 'হিজড়া' 'নপুংসক' — এসব কী হয়ে গেছে তার গা-সওয়া অলংকার?"[৪]

পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া এই প্রাত্যহিক অপমান আনন্দীকে জর্জরিত করে। যার ফলে সে এক অদ্ভুত হীনমান্যতা ও অস্তিত্বহীনতায় ভুগতে থাকে।

সামাজিক অস্তিত্বহীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা আনন্দীকে বিচলিত করে। আনন্দীর জীবনে এখন দ্বিমুখী সংকট। একদিকে তার সামাজিক অস্তিত্বহীনতা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকট। সামাজিকভাবে আনন্দীর মতো হিজড়াদের অস্তিত্বকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তেমনি মূলধারার অর্থনীতিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের বিশেষ স্থান দেওয়া হয় না। সাধারণভাবে ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গলগ্রহ হয়ে থাকাটাই আনন্দীর মতো অপূর্ণ মানুষদের ভবিতব্য। কিন্তু আনন্দী এই ভবিতব্যকে মেনে নেয়নি। ভিক্ষাবৃত্তি নয়! নিজের কর্মদক্ষতাকে অবলম্বন করে আনন্দী স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে।

জন্মগতভাবে আনন্দী বৃত্তিজীবী কুম্ভকার সমাজের একজন। 'বাছুরখোঁয়ার' গ্রামের একটি কুম্ভকার পরিবারে আনন্দীর জন্ম। জন্মাবধি সে দেখে এসেছে মাটির পাত্র তৈরীর কলাকৌশল। চাকের ওপর কাদা মাটির তাল রেখে পাত্র তৈরীর শিল্পকৌশল প্রতিটি কুম্ভকারদের সহজাত। আনন্দীও কুম্ভকারদের একজন। মাটির পাত্র তৈরির কৃৎকৌশল আনন্দীরও সহজাত। আনন্দীর সহজাত শিল্পীমন মাটির পাত্র তৈরি করতে চায়। কিন্তু আনন্দী হিজড়া!

> " 'হিজড়ে' বলে কেউ তাকে চাক-চকটবাড়ি ছুঁতে দেয় না। দিলে সেও হয়তো কুমোরের কুমোর সেরা কুমোর হতে পারত। হতে পারত। হওয়া গেল না—সে হতে পারল না।"[৫]

শৈশব থেকেই ঘরের উঠোনে রাখা মাটির সোঁদা গন্ধ সে পেয়েছে। কিন্তু মাটির পাত্র তৈরির অধিকার সে কোনোদিনই পায় না। কারণ কুম্ভকার সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী হিজড়েরা অশুভ বা অপয়া। তাই তার হাতের ছোঁয়ায় মাটির হাঁড়ি-কলসি অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া আনন্দী 'পূর্ণাঙ্গ পুরুষ' নয়। চাকা ঘোরানোর মতো পুরুষোচিত শক্তি তার নেই বলেই ধরে নেওয়া হয়। এককথায় শারীরিক অপূর্ণতার কারণে কোনোরকম সৃষ্টিশীলতার অধিকার তার নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কুম্ভকার সমাজ আনন্দীর মাটির অধিকারকে কেড়ে নেয়। কিন্তু তার কর্মক্ষমতাকে কেড়ে নিতে পারে না। কেবলমাত্র নিজের সক্ষমতাকে সম্বল করে আনন্দী হাঁস মুরগির ব্যবসাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়। অর্থনৈতিক ভাবে সফলও হয়। আনন্দী প্রমাণ করে নিজের কর্মক্ষমতাকে সম্বল করে সে একজন সক্ষম পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

আনন্দীর এই ব্যবসা বেছে নেওয়ার পেছনে এক গভীর প্রতীকী অর্থ আছে। হাঁস, মুরগি পালন ও ডিম উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে আছে জীবন ও সৃষ্টির চিরন্তন চক্র। যে সমাজ তাকে 'অপূর্ণ', 'অনুর্বর' বা 'অসৃষ্টিশীল' বলে ব্রাত্য করেছিল। আনন্দী সেই সমাজের বুকেই হাঁস মুরগির ডিম ও বাচ্চার ব্যবসার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয় সে এই প্রকৃতিরই এক সৃজনশীল অংশ।

আনন্দীর হাঁস মুরগির ব্যবসা সফল হয়। অর্থনৈতিক ভাবে সে স্বাবলম্বীও হয়। কিন্তু একজন হিজড়ে মানুষ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করছে, এটা মূলধারার সমাজ সহজে মেনে নিতে পারে না। আনন্দীকে যখন তার ব্যবসার খাতিরে বাজারে যেতে হয়েছে। কিংবা পাইকারদের সাথে কথা বলতে হয়েছে। তখন প্রতি পদে তাকে বাঁকা নজর, ফিসফাস এবং নোংরা ইঙ্গিতের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তারা আনন্দীর ব্যবসার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছে। তারা তার হিজড়ে পরিচয়কে হাতিয়ার করে বারবার কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আনন্দীর লড়াকু মানসিকতা কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয় না। আনন্দী তার সততা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে এই সমস্ত বাধাকে অচিরেই অতিক্রম করেছে।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার সুবাদে আনন্দী পরিবার ও সমাজে কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি পায়। আনন্দী বুঝে যায় বাস্তব জীবনে কাঁচা টাকার জোর। এই দ্বিচারী স্বার্থপর সমাজ তার লৈঙ্গিক পরিচয়ের চেয়ে তার পকেটের ওজনকে বেশি মূল্য দেয়।

> "আরেকবার পয়সা বাজিয়ে সে যেন বলল— খেতে দিতে হয় দাও, নচেৎ আমার পয়সা আছে—পয়সা ফেললে খাবারের অভাব হবে না। চাঁদির গুঁতোয় স-সাগরা পৃথিবীটা বশ!"[৬]

আনন্দীর লড়াইটা শুধু পেটের ভাতের লড়াই ছিল না। তা ছিল স্বীকৃতির লড়াই।

আনন্দী টাকার জোরে আপেক্ষিক ভাবে সমাজ ও পরিবারে স্বীকৃত হয়। কিমপুরুষ হওয়ার সুবাদে নারী-পুরুষ উভয় সমাজে আনন্দীর অবাধ ওঠাবসাও শুরু হয়। কিন্তু মেয়েরা তাকে গ্রাহ্য করে না, মান্যও করে না।

> "কী আছে আনন্দীর যে তারা তাকে মান্য করবে? তার সামনেই মেয়েরা দোদুল বুক খুলে মাটি দিয়ে ঘষে। জলের আঁজলা মেরে বুকের কাদামাটি সাফা করে নেয়। এতটুকু আড়ষ্ট বোধ করে না।"[৭]

সাধারণভাবে মেয়েদের সহানুভূতিশীল বলে মনে করা হয়। কিন্তু আনন্দীর প্রতি এই মেয়েদের আচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। মেয়েরা তাকে নিজেদের সমকক্ষ বা মানুষ বলে গণ্য করে না। অনবরত তাকে খালভরি, মুখপুড়ি, রাঁড়ী, মাগী বলে সম্বোধন করে। এই শব্দগুলো শুধুমাত্র গালিগালাজ নয়। এগুলো আনন্দীর লিঙ্গপরিচয়হীনতাকে ব্যঙ্গ করার ও তাকে সামাজিকভাবে ছোট করার অস্ত্র। কিন্তু আনন্দী ছিল এক আশ্চর্য সহনশীলতার প্রতীক। সে এই সমস্ত অপমানে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বরং সে তাদের সাথে যেচে গল্প জুড়ে দেয়।

অন্যদিকে পুরুষ সমাজ আনন্দীকে মানুষ হিসেবে সম্মান দেওয়া তো দূরের কথা। তার সঙ্গে অশ্লীল রসিকতা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। পুরুষেরা বন্দুক দেখানোর নাম করে নিজেদের পুরুষাঙ্গ দেখায়।

> "আচমকা পরনের লুঙিটা পুরোপুরি খুলে উলঙ্গ হয়ে গেল প্রহ্লাদ। বলল—দেখতে পাচ্ছিস, এই দ্যাক আন্দী—বন্দুক—
>
> ছিঃ থুঃ করে অনর্গল থুথু ফেলতে ফেলতে দৌড়ুল আনন্দী। দৌড়ুল গ্রামের দিকে।"[৮]

কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আনন্দী এই ধরনের অন্যায় ব্যবহারকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। স্বীকৃতির জন্য বুভুক্ষু আনন্দীকে এই ধরনের বিকৃত আচরণ খুব বেশি বিচলিত করে না। আনন্দীর এই সহনশীলতা, তার দুর্বলতা নয়। এটা তার মানুষের সংস্পর্শে থাকার ও সমাজের একটা অংশ হয়ে ওঠার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তাই গ্রামের হরিবাসরে পুরুষদের তাসের আসরে আনন্দীর ডাক পড়লে নিঃসঙ্কোচে সে উপস্থিত হয়।

> "হরিমন্দিরের চার 'খুঁটোয়' পিঠ পেতে বসে 'আঁথোল' কুমোররা 'হুলিয়া' জারি করে দেয়—'হুলিয়া'—
>
> —এই যে পান—ওদিকে যাচ্ছ? তাস নিয়ে আন্দীকে একবার হরিবাসরে আসতে বল তো।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাণকৃষ্ণ বলল—আন্দী আছে নাকি—সে তো এতক্ষণে গোলবাজার—

—ঠ্যাঙ ভাঙি তুমার গোলবাজারের! আজ সকালেও দেখলাম—সে নদীর দিক থেকে দৌড়ে আসছে। গোলবাজারে গেলে সে তো যাবে ভোর ভোর, রাত থাকতে।

নির্বাক প্রাণকৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলে সুধাংশু-হীরালাল-আশুতোষরা হরিবাসর থেকে হাত ধরে তুলে দিল প্রেমচাদকে — এই যা তো পেরেম তুই নিজে, খপর দে তো আন্দীকে। আর থাকে যদি তো চ্যাঙদোলা করে তুলে আন আন্দীকে।

আন্দী, আন্দী।

আনন্দীর দু-'পালি' তাস আছে। দু-'পালি' অর্থাৎ দু-সেট। প্লাস্টিকের তাস — গোলবাজার থেকে আনা। ঝকঝকে— খেলতে খুব আরাম। 'সাফল্' করতেও আরাম।

হাতে ঘড়ি, 'অ্যাংলোসুইস'। গায়ে ফুলশার্ট — তার ওপর তাপ্পি মারা সোয়েটার।

রীতিমতো সেজেগুজেই এসেছে আনন্দী।

তাস হাতে 'সাফল্' করতে করতে বলল — কী হবে 'বিরিজ' না 'টন্টি-নাইন'?

তার আগে আশু কুমোরই জিজ্ঞেস করল — তবে যে শুনলুম তুই গোলবাজার আন্দী?

—কে বলল?

—পান।

—ও, পান। যাব, কাল যাব—এতদিন 'মালের' জোগাড় ছিল না— বলেই হাতের ঘড়ি দেখল আনন্দী। ঘড়ি 'অ্যাংলোসুইস'।

এর মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করল—কটা বাজে আন্দী?

আনন্দী চটপট ঘড়ি দেখে তাকে উত্তর দিল—দুটো বেজে তেরো মিনিট হয়ে এই সাড়ে সাতাশ সেকেন্ড।...

খেলতে বসেছিল চারজন—সুধাংশু-হীরালাল—আশুতোষ আর আনন্দী। আশুকুমারের 'পার্টনার' ছিল আনন্দী।"[৯]

আনন্দী গ্রামের হরিবাসরে পুরুষদের সাথে এক আসনে বসার অধিকার পায়। পুরুষদের সাথে একত্রে বসে তাসও খেলে। যা পুরুষমহলে তার স্বীকৃতির সূচক। কিন্তু এই স্বীকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যটা আনন্দী অচিরেই বুঝতে পারে। আনন্দী বুঝতে পারে এই সামাজিক স্বীকৃতির কোনো গভীরতা নেই। অন্তঃসারশূন্য এই স্বীকৃতির স্বরূপ উন্মোচিত হয় আশুকুমোরের ক্ষিপ্ত বাক্য বানে।

"শালা এই অপয়া নপুংসক—যার মুখ দেখলেও অযাত্রা—তাকে নিয়ে কখনো খেলা যায়! আর সে খেলায় কখনো জেতা যায়! ... অপয়া হিজড়ার সঙ্গে আর খেলব না—হরগিজ না— ...

বলেই হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে আনন্দীর জায়গায় আরেকজনকে বসিয়ে নিল আশুকুমোর।

আনন্দীর আর কিছু করার ছিল না ... সেখান থেকে উঠে গেল। তার তাসগুলো থাকলো। প্লাস্টিকের তাস— ঝকঝকে, খেলতে আরাম, 'সাফল্' করতেও—

তারা তার তাসগুলো নিল, তাকে নিল না। আনন্দীকে নিল না, আনন্দীর জিনিসগুলো নিল।"[১০]

গ্রামের পুরুষেরা আনন্দীকে তাদের সাথে বসতে দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাকে স্বীকার করে নয়। নিজেদের প্রয়োজনে! পুরুষেরা আনন্দীকে ততটুকুই গ্রহণ করেছে। যতটুকু তার কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া সম্ভব। আনন্দীর কেনা দামী তাসের প্রয়োজনে তাকে দলে টেনেছে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে 'অপয়া' বলে তাড়িয়েও দিয়েছে।

আনন্দী পুরুষ সমাজের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নারী সমাজের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়। ক্রমশ তার মনে পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে ওঠার কামনা জাগে। মা হওয়ারও বাসনা জাগে। কারণ একজন নারীর পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তার মাতৃত্ব।

আনন্দী অন্তত একবারের জন্যও পূর্ণাঙ্গ নারীত্বের উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। মাতৃত্বের আস্বাদ নিতে চেয়েছিল। সত্যি সত্যি তো নয়! মিথ্যা মিথ্যে মা হতে চেয়েছিল। রক্তমাংসের মানব শিশুর নয়, মাটির পুতুল টুসুর মা হতে ছেয়েছিল। তাও মাত্র এক রাতের জন্য। 'বাউরির রাতে' অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির আগের রাতে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'বাউরির রাতে' অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির আগের রাতে 'টুসু পরব' পালন করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের অন্যতম উৎসব টুসু পরব। টুসু মূলত কুমারী মেয়েদের নিজস্ব পরব হলেও এটি আসলে উর্বরতা ও মাতৃত্বের পরব। টুসু কোনো রক্ত মাংসের মানুষ নয়। টুসু মাটির তৈরি একটা পুতুল মাত্র।

> "টুসু তো মাটির প্রতিমা, মাটির ঢেলা—মাটি মাটি মাটি। মাটির মুখ মাটির নাক—"[১১]

কিন্তু গ্রাম সমাজে এই মাটির পুতুলটিকে জীবন্ত কন্যাসন্তান হিসেবে দেখা হয়। তাকে সন্তান স্নেহে অর্চনা করা হয়। মন্ত্র তন্ত্রের বাহুল্য না রেখে টুসুকে গান গেয়ে বন্দনা করা হয়। নারী জীবনের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ এই গানের বিষয়। অবশেষে মকর সংক্রান্তির দিন সুবর্ণরেখা নদীতে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, টুসু পরবে একজন নারীকে টুসু মা হিসেবে মনোনীত করা হয়। টুসু মা হিসেবে তাকে বিশেষ সম্মানও দেওয়া হয়। সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতির বুভুক্ষু আনন্দী টুসুর মা হওয়ার সূত্রে এই সমাজে নিজের অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল।

> "টুসুর মা সাজতে চেয়েছিল আনন্দী। তাও আসল নয়, নকল। তাও চিরদিনের জন্যও নয়, একদিন একরাতের জন্য। বাঁউড়ির রাতে, মকর-সংক্রান্তির আগের রাতে, শাড়ি-চুড়ি পরে টুসুর মা সেজে সে চূড়চূড় বসে থাকবে। আর ভাস্বতী আর শৈল আর মুনকু আর নেনেই তাকে খোঁটা দিয়ে গান বাঁধবে।"[১২]

বাঁউরির রাতে আনন্দী নিজেকে শাড়িতে, গয়না, সিঁদুরের টিপে সুন্দর করে সাজায়। নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে কল্পনা করে তৃপ্তি পায়। কিন্তু কল্পনার বাস্তবের মধ্যে বিস্তার ফারাক। আনন্দী হয়তো সেটা বুঝেও বুঝতে চায়নি।

> "বাউড়ির রাতটা বড়, আনন্দীর ইচ্ছাটাও বড় ছিল। মা হতে চেয়েছিল আনন্দী, হতে পারল না।"[১৩]

আনন্দীর ইচ্ছাটা খুব বড় ছিল। আনন্দী মা হতে চেয়েছিল। কিন্তু টুসু মা হওয়ার প্রকৃত দাবিদারেরা একজোট হয়ে আনন্দীকে চরম লাঞ্ছনা করে। আনন্দীকে টুসুর ঘরের চৌহদ্দি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

> "এক হ্যাঁচকায় আনন্দীর শাড়ি খুলে ফেলল ভাস্বতী। হাসতে হাসতে বেদম হয়ে আনন্দীর চুল ঘেঁটে দিল শৈল, মুনকুরা। চোখের কাজল মুখের লিপস্টিক গুলিয়ে হান্ডুল-মান্ডুল করে ছাড়ল মুখময়। টুসুর গান নয়—টুসুর গান ছাপিয়েও উপরে উঠল তাদের হাসি, হৈ-হট্টরোল। তারা তাদের দল থেকে টুসু-ঘর থেকে ঘরের চৌহদ্দি থেকে খেদিয়ে দিল আনন্দীকে।"[১৪]

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আনন্দীর স্বঅস্তিত্বকে। "আনন্দী, একটা হিজড়া নপুংসক।"[১৫] আনন্দীর বুক ঠেলে আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও প্রার্থনা "দয়াল হরি! পরের জন্মে মা করো নয়তো বাপ কর হে—"[১৬] আনন্দী এই দীর্ঘশ্বাস কোনো ক্ষোভের নয়। এক চরম ক্লান্তি ও পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাস।

আনন্দী নিজের অস্তিত্বের সত্যতা খুব ভালভাবেই জানে। তবুও সে চেয়েছিল সমাজের মূল স্রোতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো সামাজিক স্বীকৃতি পেতে। লিঙ্গ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে। কিন্তু এই সমাজ তাকে ততটুকুই গ্রহণ করেছে, যতটুকু তাদের প্রয়োজন হয়েছে। আনন্দী বুঝতে পারে সে যতই নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন। এই সমাজ তার লৈঙ্গিক পরিচয়কে হাতিয়ার করে ততই কোণঠাসা করবে।

নলিনী বেরার 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসে আনন্দী চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। আনন্দী চরিত্রটি আমাদের পরিচিত হয়েও যেন চেনা ছকের বাইরের। আনন্দী কেবল হিজড়া জীবনের চিরাচরিত দুঃখ-কষ্টের প্রতিনিধি নয়। সে পুরুষতান্ত্রিক চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে আপন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত প্রতিবাদ। আনন্দীর শরীরী অপূর্ণতা, পারিবারিক বর্জন, মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়, সামাজিক অবহেলা, সর্বোপরি তার মানবিক অস্তিত্ব সংকটকূল অনুভূতিকে আশ্চর্য মায়াময় দক্ষতায় চিত্রিত করা হয়েছে এই উপন্যাসে। নলিনী বেরার এই 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসটি যেন আনন্দীসহ সমগ্র তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া মানুষদের মনোজগতে ঘটে চলা শব্দাতীত দহন ও তাদের অস্তিত্বের উত্তরণের এক কালজয়ী উপাখ্যান।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 157 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১০
২. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯
৩. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯
৪. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩৮
৫. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৬
৬. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৭
৭. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২
৮. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৪
৯. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩৫
১০. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩৮
১১. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২১
১২. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪১
১৩. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৫
১৪. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৫
১৫. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৪
১৬. বেরা, নলিনী, অপৌরুষেয়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৬